যুগান্তর

তারিখ 10 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

এ কে এম শাহনাওয়াজ

দুর্বল ভিত্তির ওপর সুউচ্চ ইমারত হয় না

আমার এক আত্মীয় একটি তিন তলা বাড়ি বানিয়ে মহাবিপত্তিতে পড়েছেন। নানা নির্মাণ ত্রুটি ধরা পড়েছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির নকশা করেছেন ও নির্মাণের সার্বিক তদারকি করেছেন। তিনি পলিটেকনিক কলেজ থেকে পাস করে ড্রাফটসম্যানের চাকরি করতেন। পরে একটি মধ্যমমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় স্নাতক করেছেন। বুঝলাম স্থাপত্য বিদ্যার সঙ্গে খুব দূরবর্তী আত্মীয়তা আছে তার। শেষ পর্যন্ত ইমারতের ফল ভালো হয়নি।

ব্যক্তির ভুলে একজন ব্যক্তির না হয় ক্ষতি হল। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভুলে যদি জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বড় ক্ষতি হয়, তাহলে এর দায় কে নেবে? ২০০২-এর একটি স্মৃতিচারণ করি। আমি জানতে পারলাম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষিত বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ সংস্কারের নামে বিকৃত করা হচ্ছে। কিছুদিন দেশের বাইরে থাকায় একটু বিলম্বে পেয়েছিলাম খবরটি। দেরি না করে বাগেরহাটে চলে গেলাম। দেখি ইতিমধ্যে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। মসজিদের ভেতরের অংশ সংস্কার ও নবরূপায়ণ করা হয়েছে। কাউকে চোখ বেঁধে এনে মসজিদের ভেতরে ঢুকিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দিলে তিনি বলবেন বিশ শতক বা সাম্প্রতিক সময়ের মসজিদে এসেছেন। অথচ ষাটগম্বুজ পনেরো শতকের মসজিদ। বাংলার সুলতানি আমলের মসজিদের গঠনশৈলী পরবর্তী মোগল মসজিদের চেয়ে আলাদা ছিল। এ পর্বে প্লাস্টারের কৌশল আয়ত্তে আসেনি। শুধু চুন-সুরকিতে লাল ইট গাঁথা হতো। মাঝে মাঝে দেয়ালে দেয়া হতো চুনের কোটিন।

দেখলাম মসজিদের ভেতরটা পুরু প্লাস্টার করে সাদা রঙে ঝলমল করছে। বিশাল আকারের পাথরের স্তম্ভগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান হয়েছে। ইট দিয়ে মুড়ে প্লাস্টার করে ঢেকে দেয়া হয়েছে ওগুলো। ঐতিহ্য ধ্বংসের বাকি কিছু রাখা হয়নি। জানি না আর ক'দিন পর কাজ ধরা হলে বহিরাঙ্গও 'আধুনিক' হতো কিনা। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের সংস্কার সংরক্ষণ কাজে প্রকৌশলীদের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু সাধারণত তখন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্ন-ইমারত সংরক্ষণের তেমন একাডেমিক প্রশিক্ষণ থাকত না। তাই জানলাম ভেতরের সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার পর কমিটির লোকজন পরিদর্শনে এলে কে একজন নাকি বলেছিলেন এ অবস্থা হিসট্রিয়ানরা দেখলে প্রশ্ন তুলবে। শুনে প্রধান প্রকৌশলী নাকি বলেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার জানে কেমন করে বিল্ডিং শক্ত করতে হয়। অন্যরা কী বুঝবে?

প্রায় দেড় যুগ আগে শরীয়তপুরে মধ্যযুগের টোল ও কয়েকটি মন্দির নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। এখানে অন্যতম একটি ইমারত ছিল মোগল যুগে নির্মিত পরিত্যক্ত দুর্গা মন্দির। মন্দিরটির উপরের পলেস্তারা ছিল চমৎকার কারুকার্য। বছর চারেক আগে গিয়ে দেখি জেলা প্রশাসনের দেয়া অর্থ-সাহায্যে সব অলংকরণ উঠিয়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। অজ্ঞতার কারণে প্রত্নআইন উপেক্ষা করে সরকারি অর্থে নষ্ট করা হচ্ছে ঐতিহ্য।

এই উদাহরণগুলো এখানে উপস্থাপনের একটি কারণ রয়েছে। বিশেষায়িত জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থপতির জায়গায় একজন ড্রাফটসম্যান দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে বিল্ডিং দাঁড়াবে ঠিকই, কিন্তু কুরে কুরে খাবে এর অন্তর। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নীতিনির্ধারণের দুর্বলতা দেখলে মনে হয় ডাক্তারের দায়িত্ব কম্পাউন্ডাররাই পালন করছেন। এ অঞ্চলে প্রকৃত শিক্ষাবিদ ছাড়া আমলা, মন্ত্রী সবাই রাজা— অসাধারণ বিশেষজ্ঞ! আমার দৃষ্টিতে অনেকদিন পরে একজন নেতা হিসেবে শেখ হাসিনাকে পেয়েছি, যিনি দেশকে ভালোবাসেন, মানুষকে ভালোবাসেন। দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ে তাকেই খবরদারি করতে হবে কেন? চারপাশে বাকসর্বস্ব অদক্ষদের ছড়াছড়ি বলে? আমরা বিশ্বাস করি গোলাপগাছ দিয়ে গোলাপ ফোটাতে পারলে অনেকটা সাফল্য আসত। কাঠগোলাপ তো আর গোলাপ নয়। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে দায় তো চলে যাবে প্রধানমন্ত্রীর ওপরই।

গভীর থেকে শিক্ষা সংকট বুঝতে হলে শিক্ষাবিদেরই প্রয়োজন হবে। না হলে সংকটমুক্ত হওয়া যাবে না। বাংলায় কোম্পানি শাসন যুগে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য জমিদারদের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করার পদক্ষেপ নেন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস। তার উদ্দেশ্য ছিল কম উর্বর জমি ফেলে না রেখে যাতে সবই চাষের আওতায় নিয়ে আসেন জমিদাররা। এ জন্য প্রথম একসালা বন্দোবস্ত করলেন। তার ধারণা এক বছর পর জমি যদি নিলামে চলে যায় তাই যতটা পারা যায় এ বেলা চাষ করে নেবেন তারা। কিন্তু জমিদার চাষই বন্ধ করে দিলেন। একইভাবে পাঁচসালা বন্দোবস্তও ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের প্রিভি কমিটি বুঝল বাংলার জমিদারদের মনোভাব ধরতে পারছেন না হেস্টিংস। তাই তাকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের জমিদারপুত্র লর্ড কর্নওয়ালিসকে পাঠানো হল গভর্নর জেনারেল করে। স্বগোত্রীয় হওয়ায় ঠিক বুঝে গেলেন জমিদারদের মনোভাব। বুঝলেন এরা জমির ওপর স্থায়ী কর্তৃত্ব চায়। এভাবেই ঘোষিত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

গত সপ্তাহে এই কলামে আমি বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে লিখেছিলাম। প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জয়পুরহাটের একজন স্কুল শিক্ষক বাসেদ সাহেব একটি নাতিদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তার বক্তব্যের বিষয় আমার কম বেশি জানা ছিল। তবুও চিঠির ছত্রে ছত্রে লেখা শিক্ষকের অসহায়ত্ব আমাকে ছুঁয়ে যায়। বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের দুর্দশার কথা শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ নিজেকে অপরাধী ভাববে। শুনে মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

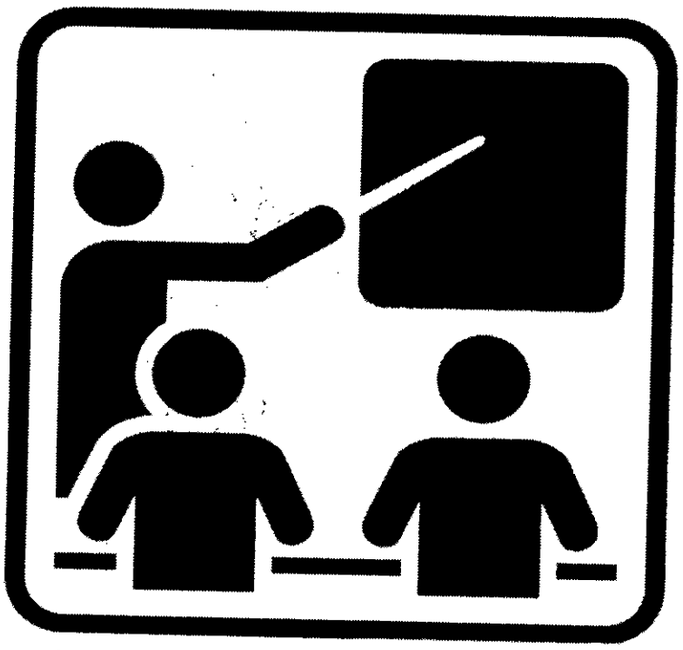

আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, শুধু আর্থিক সংকটই নয়— সামাজিকভাবেও শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয় প্রতিদিন। স্কুল পরিচালনা কমিটির ওপর রাজনৈতিক নেতা-জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। গণতন্ত্রের কুশলী আবরণে পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত হয়। রাজনৈতিক শক্তির অনুগতরাই স্কুল পরিচালনায় আসেন। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের গণ্ডি না পেরোনো অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তুচ্ছজ্ঞান করেন শিক্ষকদের। সদস্যদের অনেক অন্যায় দাবি মানতে হয়। অনেক সময় সরকারি আমলারা স্কুল কমিটিতে এসে এমন আচরণ করেন যাতে মনে হয় না এরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর প্রায় ৯০ ভাগ বেসরকারি। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পড়ছে এসব স্কুলে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়েই এখানে হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন। আর সেই শিক্ষকদের একজন বাসেদ সাহেব সবার হয়ে যখন বলেন, 'আমাদের যে কী ধরনের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় তা যদি বাস্তবে এসে দেখেন স্যার, তাহলে অনুধাবন করতে পারবেন এ দেশে শিক্ষকদের মধ্যে কতটা বৈষম্য', তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। সাধারণভাবে বেসরকারি স্কুলগুলোর যে চিত্র তাতে খুব কম স্কুলই আছে যেখানে শিক্ষকরা মাসের ১৪-১৫ তারিখের আগে বেতন পান। অন্যদের মতো শতভাগ বোনাসও নেই। বরাদ্দ নেই বৈশাখী ভাতার। কোনো প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা নেই। সন্তানদের জন্য কোনো বাড়তি সুবিধা নেই। ঈদের আগে সরকারি-বেসরকারি চাকুরেরা বোনাস পেয়ে সন্তান পরিজনদের মধ্যে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে অনেক স্কুলের শিক্ষক ঈদের পর দয়া দাক্ষিণ্যে হয়তো আংশিক বোনাস পান। নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবস্থা তো আরও করুণ।

আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, শুধু আর্থিক সংকটই নয়— সামাজিকভাবেও শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয় প্রতিদিন। স্কুল পরিচালনা কমিটির ওপর রাজনৈতিক নেতা-জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। গণতন্ত্রের কুশলী আবরণে পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত হয়। রাজনৈতিক শক্তির অনুগতরাই স্কুল পরিচালনায় আসেন। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের গণ্ডি না পেরোনো অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তুচ্ছজ্ঞান করেন শিক্ষকদের। সদস্যদের অনেক অন্যায় দাবি মানতে হয়। অনেক সময় সরকারি আমলারা স্কুল কমিটিতে এসে এমন আচরণ করেন যাতে মনে হয় না এরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন।

অর্থশক্তিতে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন করে আমরা এই শিক্ষকদের কর্তব্যে নিবেদিত হওয়ার দাবি করি কীভাবে? একজন বড় আমলার ড্রাইভার যেটুকু আর্থিক নিরাপত্তা পান, স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা দুরাশা। আমি শিক্ষামন্ত্রীদের মুখে কখনও এই শিক্ষকদের নিয়ে ভাবনার কথা শুনি না। দায়িত্ব ও ক্ষমতাবান আমলারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নেয়ার নানা পথ তৈরি করেন, কিন্তু শিক্ষকের মর্যাদা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের কথা কখনও ভাবেন না।

আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, আজকাল খুব অস্বস্তিতে ভুগি। অনেক বেছে যখন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করি, তাদের স্কুল-কলেজের একাডেমিক দুর্বলতা চোখে পড়ে ক্লাসে। বিরক্ত হই স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ওপর। কেন তারা ভিত্তি সবল করে দেন না। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবতা সামনে এসে দাঁড়ায়। একদিকে নিরীক্ষার অক্টোপাশে হাবুডুবু খাচ্ছে দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিকুলাম আর পরীক্ষা পদ্ধতি, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেয়ার মশাল তুলে দেয়া হচ্ছে বিপর্যস্ত হতাশ শিক্ষকদের হাতে।

সভ্য দেশগুলো ভাবে শিক্ষা হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় খাত। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি জাতিকে এগিয়ে নেবে। আর শিক্ষার্থীকে চৌকস হিসেবে গড়ে তুলবেন শিক্ষক। এ কারণে শিক্ষক উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ থাকে রাষ্ট্রের। আমরা বড় বড় কথা বলছি প্রতিনিয়ত। আইন করে গাইড-নোট বই বন্ধ করতে চাইছি। শিক্ষকদের কোচিং-টিউশন বন্ধ করতে চাইছি। এসব শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু পাশাপাশি একবারও ক্ষমতাবানদের বলতে শুনি না বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে সরকারি, বেসরকারি, এমপিওভুক্ত, নন-এমপিওভুক্ত সব শিক্ষককে বৈষম্যহীন মর্যাদার জায়গায় নিয়ে আসব। বাস্তবে এমন অবস্থা ও পরিবেশ তৈরি করতে পারলে মেধাবী ছেলেমেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিক্ষকতার পেশায় আসতে উৎসাহিত হবে। ভিত্তি শক্ত না করে সুউচ্চ ইমারত আশা করা যায় না।

এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

shahnawaz7b@gmail.com